Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.51-57
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' এবং ব্রাত্যজনের 'রুদ্ধসঙ্গীত'—এক তুলনামূলক নিরীক্ষণ

ড. সোমদত্তা ঘোষ (কর)
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়, কলকাতা ,পশ্চিমবঙ্গ ,ভারত

সারসংক্ষেপ

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। আর বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার, অধ্যাপক, অভিনেতা, নাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই আত্মজীবনী দিয়েই তাঁর নাট্যগোষ্ঠী 'ব্রাত্যজন'-এর প্রথম যাত্রা শুরু করেন ২০০৯ সালে, নাটকের নাম 'রুদ্ধসঙ্গীত'। দেবব্রত বিশ্বাসের 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' নিয়ে ব্রাত্য বসু 'রুদ্ধসঙ্গীত' নাটকটি লিখলেও নাট্যকার নিজেই বলেছেন --- "বিশেষ একটা ইতিহাস বা একজন সঙ্গীত শিল্পীর জীবন তো অবলম্বন হিসাবে ছিলই, কিন্তু আমি শুধুমাত্র তারই মধ্যে রুদ্ধ থাকতে চাইনি।" মূলপ্রবন্ধের আলোচনায় আমরা গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি কোথায় এদের স্বতন্ত্র আর কোথায় সাম্যতা।

Word Key: দেবব্রত বিশ্বাসশিল্পীর সঙ্কট ও ,রাজনীতি ,রবীন্দ্রসঙ্গীত ,গণনাট্য ,ব্রাত্য বসু , আত্মমর্যাদাবোধ।

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। এখানে লেখক কেন গ্রন্থের এই নামকরণ করলেন সে প্রসঙ্গে জানিয়েছেন নিজেই-" আমার মনে আছে আমি জন্মেছিলাম "ম্লেচ্ছ" হয়ে—শেষজীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে হয়ে গেলাম "হরিজন"—কেন ম্লেচ্ছ এবং কী করে হরিজন এই ব্যাপারটি জানবার ঔৎসুক্য হয়তো অনেকের হতে পারে- কারণ যতই বিনয় করি না কেন, আমার বেশ ভালো করেই উপলব্ধি হয়েছে যে অগণিত রবীন্দ্রসংগীত প্রেমিকদের অকৃত্রিম এবং অকুণ্ঠ ভালোবাসা সারা জীবন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তাই ভাবলাম এই ব্যাপারেই কিছু লিখতে চেষ্টা করি যাতে ওই রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমিকরা আমার "হরিজন" হয়ে যাবার ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হতে পারেন।"[১]

বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার, অধ্যাপক, অভিনেতা, নাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই আত্মজীবনী দিয়েই তাঁর নাট্যগোষ্ঠী 'ব্রাত্যজন'-এর প্রথম যাত্রা শুরু করেন ২০০৯ সালে, নাটকের নাম 'রুদ্ধসঙ্গীত'। যদিও তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন -- "এই বিশেষ নাটকটির মাধ্যমে কিন্ত আমি এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত শিল্পীর নিছক জীবন গাথা বর্ণনা করতে চাইনি। বরং, বলা যেতে পারে আমার তরফে এই নাটক যেন নিজের মতো করে গড়ে তোলা একটা যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। যেখানে কিছু চরিত্রকে কেন্দ্র করে দেশ-কালের একটা বিশেষ স্থানাঙ্ক যেন জন সমক্ষে এসে গেল। বিশেষ একটা ইতিহাস বা একজন

সঙ্গীত শিল্পীর জীবন তো অবলম্বন হিসাবে ছিলই, কিন্তু আমি শুধুমাত্র তারই মধ্যে রুদ্ধ থাকতে চাইনি। আমি সেই বিষয়টাকে আমার সময়ের প্রেক্ষিতে রেখে দেখতে চেয়েছিলাম যে ওই ধরনের যুক্তি তর্ক গপ্পোগুলো তখনও কিভাবে বিদ্যমান।"[২] এইভাবে গ্রন্থটি ও নাটকটি নিয়ে এক তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে দেখা যেতে পারে কোথায় এরা স্বতন্ত্র আর কোথায় সাম্যতা।

স্বনামধন্য ভারতীয় আদ্যন্ত বাঙালি রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী ও শিক্ষক হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ও গণসঙ্গীত গায়কও ছিলেন তিনি। তিনি প্রায় ৩০০ রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেন। দেবব্রত বিশ্বাস জীবনে কখনো কোনো কিছুর সঙ্গে আপোস করেননি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে তাঁর জীবন পরিক্রমা ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনী 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' শুরু হয়েছে কেরানী জীবনের কাহিনী দিয়ে। নাম 'আমার কেরানী জীবন'। জানা যায় তিনি লেখা শুরু করেছেন ১৯৭৮ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে। তিনি বিনা মাইনেতে হিন্দুস্তান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ শুরু করেছিলেন ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৫ সালে তাঁর পাকা খাতায় নাম ওঠে। ১৯৫৬ সালে জীবনবীমা অফিসগুলির জাতীয়করণ হয়। তখন থেকে তিনি লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কেরানী হয়ে গেলেন এবং এই কেরানী জীবন শেষ হয় ১৯৭৮ সালে তাঁর ৬০ বছর বয়সে। LIC থেকে অবসর নেবার কথার সঙ্গেই উঠে এসেছে তাঁর বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে হতাশার কথা, .অফিসের ইউনিয়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। ২৭ বছর বয়সে ১৯৩৭-৩৮-র সময়কাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রপাত। কিন্তু ১৯৬২-র সময় বামপন্থী আদর্শের মধ্যে নানা মতবিরোধ, দ্বিচারিতা তাঁকে এই রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে হতাশ করেছিল। এর সাথে ছিল অফিসের রাজনীতি। এই সব কিছু মিলিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় হঠাৎ অসুস্থ হবার কারণে তাঁকে ভর্তি হতে হয় শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। সেই সময় যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁরা হলেন হেমন্ত মুখার্জী, সন্তোষ সেনগুপ্ত. বাবুল ব্যানার্জী প্রমুখেরা। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে দেখতে যান। তাঁর অফিসের দুজন সহকর্মী অজিত দাশগুপ্ত ও শান্তিনাথ চক্রবর্তী হাসপাতালে সারারাত জেগে পাহারা দিতেন। যাঁরা রোজ তাঁর খবর রাখতেন, তাঁরা হলেন ত্রিদিব সেন, মায়া সেন, বাণী ঠাকুর, ঢাকার গায়ক কাদেরী কিরিয়া, পাহাড়ী সান্যাল। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তিমিত্র তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। এঁদের সকলকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এর পরের অনুচ্ছেদের তিনি নামকরণ করেছিলেন "আমার পূর্ববঙ্গের জীবন এবং কেন ম্লেচ্ছ হলাম"। এখান থেকে জানা যায় ১৯১১ সালের ৬ই ভাদ্র ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইটনা গ্রামে তাঁর জন্ম হয় রামমোহন রায়ের জন্মেরই দিনে। রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় দেবব্রত বিশ্বাসের পিতামহ কালীকিশোর বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এর ফলস্বরূপ শৈশবেই হিন্দুদের কাছে তিনি ছিলেন ম্লেচ্ছ। তাঁর মা আগে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গান করতেন। বাড়ীতেও নিয়মিত ব্রাহ্মসঙ্গীত গাওয়ার চর্চা ছিল। এই 'ম্লেচ্ছ' পরিবারেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে সুরের, গানের, রবীন্দ্রগানের। মায়ের কাছে তিনি শুনতেন, শিখতেন ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত। যেগুলি গাওয়া হত সেগুলি হল—'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে', 'আনন্দলোকে মঙ্গলা লোকে', 'আজি যত তারা তব আকাশে', 'ব্রহ্মাম বদনেতে বল অবিরাম' ইত্যাদি। স্কুলে পড়ার সময় ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মাঘোৎসবে তিনি মায়ের সঙ্গে ও ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বছর গান গাইতেন। তাঁর নাম জর্জ হয়েছিল ছোটবেলাতেই। বাবা দেবেন্দ্রমোহন স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় গির্জার হাতে ছেলেকে সঁপে ছিলেন। সেখান থেকে তাঁর নাম দেওয়া হয় জর্জ। কারণ তখন পঞ্চম জর্জ ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা। ১৯২৭ সালে কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল

থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯২৭-র শেষের দিকে ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হলেন। এর পরের বছরই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটল তাঁর জীবন-দেবতা রবীন্দ্রনাথের। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ভাদ্রোৎসবে দেবব্রত বিশ্বাস প্রথম দেখলেন তাঁর জীবনদেবতাকে। এর উল্লেখ আছে 'রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য' অধ্যায়ে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির নাম হল 'শান্তিনিকেতন প্রথম দেখলাম', 'গায়ক হব স্বপ্নেও ভাবিনি', 'বাঁয়ের রাস্তা', 'হিন্দুস্তান রেকর্ডিং কোম্পানীতে প্রথম প্রবেশ', 'বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি সংক্রান্ত পত্রাবলী', 'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে', 'স্বাধীন বাংলাদেশে আমার সঙ্গীত পরিবেশন', 'একটি অসাক্ষাৎকার', 'চিঠিপত্র প্রথম কিস্তি', 'অন্যান্য রচয়িতাদের গানের রেকর্ড', 'চিঠিপত্র : দ্বিতীয় কিস্তি', 'দেবব্রত বিশ্বাসের অপরাধ কি?', 'বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি সংক্রান্ত পত্রাবলী-তৃতীয় কিস্তি', এবং 'উপসংহার'। এই অধ্যায়গুলিতে ১৯৩৮-এ তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড, বিভিন্ন মঞ্চে গান পরিবেশন, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ, নানা ব্যক্তিবর্গর সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদির উল্লেখ ছাড়াও ৪০-৭০-এর দশকের শিল্প, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, রাজনীতির জগত উঠে এসেছে আলোচনায়। তাঁর 'বাঁয়ের রাস্তা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে বামপন্থী জামানার উত্থান, গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, তার যাত্রা। তিনি যখন গান গাইছিলেন, তখন সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার ভাষা বদলাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছিল শিল্প। গণনাট্যর সঙ্গে সেই সূত্রে দেবব্রতর আলাপ। ১৯৩৯ সালে ২য় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিউট, ফ্যাসীবিরোধী লেখক, শিল্পী ইত্যাদি সঙ্ঘের আমন্ত্রণে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি নানাধরনের স্বদেশী গান গাইতেন। তাঁরা উদয়শঙ্করের ছায়া নাটকের সাফল্য দেখে সেই কায়দায় নাটক নির্মাণ করেন। ছায়া নাটকের নাম ছিল 'শহীদের ডাক'। কলকাতার গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করতেন। ওদের গানের দলে দেবব্রত বিশ্বাসও থাকতেন। এই সূত্রে যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহানী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ১৯৪৭-র দেশভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন জানালেন। তাদের নতুন থিসিস হল 'Support Nehru Govt' এটা দেবব্রত সমর্থন করতে পারেন নি। বামপন্থী মানুষের কথা শোনাতে চেয়েছিল যতটা, ততটা শুনতে চায়নি। গণনাট্য শিল্পীদের মধ্যে সফল হয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। তিনি শুনতেও চেয়েছিলেন। 'দেশ ভেঙেছে তাই বলে কি জাত-বাঙালি ভাঙবে রে' -- শৈলেন রায়ের লেখা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে দেবব্রতর গায়কি আমাদের ভাবায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানকে গণ সঙ্গীত বলেই ভাবতেন। সেই গান নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর সেই একই ভূমিকা ছিল। বৈচিত্র্যময় জীবন ছিল। কখনো তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন কলিম শরাফি। কখনো কইফি আজমিকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন ধুতি পৈতের ছদ্মবেশে সাজিয়ে। কখনো বা তাঁর ঘরে আলোচনায় রত ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্ররা। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী, বিতর্কিত শিল্পী। তিনি প্রচার চাইতেন না। শিল্পী সংসদের অনুষ্ঠানে গাওয়াবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। বহু কষ্টে রাজি করিয়েছিলেন। শর্ত ছিল অনুষ্ঠানের প্রচারে বা বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম লেখা যাবে না। সেই মতোই অনুষ্ঠানে তাঁর নাম না করে উত্তমকুমারের ঘোষণাটি ছিল, এবার গান শোনাবেন এক বিতর্কিত শিল্পী। এমনই মানুষ ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। সব কিছু ঠিক থাকলেও ১৯৬৪-তে 'মেঘ বলেছে যাব যাব' ও 'এসেছিলে তবু আসো নাই' এই দুটি গানের গায়কীতে আপত্তি তুলল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি সবই বিশ্বভারতীর সঙ্গে

যা চিঠির আদানপ্রদান হয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাতেই বিন্যস্ত। এইভাবেই শেষ হয়েছে আত্মজীবনী।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম দুটি রের্কড ছিল 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' এবং 'যেতে যেতে একলা পথে'। এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রূপে এক নিজস্ব ঘরানা তৈরী করে নেন। এর পাশাপাশি গননাট্য সঙ্ঘের সাথে, IPTA-র সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর পরিচয় ঘটে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে। এ ছাড়াও পরিচিত হন মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। এমন স্বাধীনচেতা শিল্পীর ১৯৬৯ সালে আরো দুটি গান রেকডিং বন্ধ করল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড। স্বরলিপি না মানা ও অতিরিক্ত যন্ত্রানুসঙ্গ ব্যবহারের অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথের গানে কি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা উচিত তার তালিকাও দেয় বোর্ড। এই নিয়ে বিরুদ্ধমত পোষণ করে তিনি চিঠি দেন বোর্ডকে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা লেখা উল্লেখ করেই তিনি যুক্তি সাজান। এই নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলে নানা চাপানউতোর। তিনি অপমানিত বোধ করেন ও ভিতরের রাজনীতির খেলা বুঝতে পেরে ক্রমশ নিজেকে অনুষ্ঠান করা থেকে, রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ডিং থেকে সরিয়ে নেন, বন্ধ করে দেন। তিনি কারোর সঙ্গে আপোস করেননি। তাই তিনি বিতর্কিত। তিনি হয়ে পড়েছিলেন 'ব্রাত্যজন'। অথচ দেশে বিদেশে ছিল তাঁর অগুন্তি শ্রোতা। তাই আত্মজীবনীর শেষে তিনি বলেছেন –"সংগীত সমিতির আদালতের রায় কবে প্রকাশিত হবে জানি না। গত সাত আট বৎসর আমি কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করিনি। ইতিমধ্যে আমার বয়সও অনেক বেড়ে গিয়েছে। শ্বাসরোগ এবং নানা ধরণের জটিল রোগে ভুগে ভুগে গান গাইবার শক্তিও আমার নিঃশেষিত। ভবিষ্যতে সঙ্গীত সমিতির রায় আমার সপক্ষে হলেও রেকর্ড করবার মত স্বাস্থ্য আমার আর নেই, শক্তিও নেই। তাই গান গেয়ে যে অসংখ্য দেশবাসীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা সারাজীবন কুড়িয়ে আমি ধন্য হয়েছি, তাঁদের কাছে আমার বিনীত মিনতি তাঁরা যেন আমায় দোষারোপ করে আমার প্রতি অবিচার না করেন। আমি আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতে পারিনি কিন্তু আমি সত্যিই অভিমানী নই।"[৩] কিছু নিয়মের বেড়াজাল তাঁর সঙ্গীত রুদ্ধ করে দিয়েছিল, করে তুলেছিল ব্রাত্যজন। কিন্ত শিল্পীসত্তা, আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল থাকার কারণে বর্তমানেও দেবব্রত বিশ্বাসকে সঙ্গীতজগতের এক মাইল ফলক বলে মনে করায়। "তিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতেন, ভালবাসতেন। আর তাই তাঁর মতো করে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে চর্চা আর কেউ করে উঠতে পারেন নি। তাঁর মতো করে রবি ঠাকুরের গান কেউ ভাঙতেও পারেননি। এ নিয়ে বিতর্ক তিনি বেঁচে থাকতেও ছিল। আজ ও আছে।" (News 18 Bangla,August,22,2019)। ১৯৭৮-র ১৫ এপ্রিল থেকে ১৯৭৮-র ভাদ্র পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছে এই আত্মজীবনী 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। ১৯৮০ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। কিন্তু সঙ্গীত তাঁকে করেছে চিরজীবী, অমর।

শিল্পীর কদর একজন সমঝদার শিল্পীই করবেন । তাই ব্রাত্য বসু তাঁর প্রথম যে নাটক মঞ্চায়ন করালেন, তা 'রুদ্ধসঙ্গীত'। দেবব্রত বিশ্বাসের গান ও জীবন সংক্রান্ত এই নাটক। দেবব্রত বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনায় বলেছিলেন যে তিনি তিনটি দিক থেকে দেবব্রত বিশ্বাসকে দেখেছিলেন। ১. রাজনীতির সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের সম্পর্ক। প্রধানত গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর যুক্ত হওয়া ও সঙ্ঘারাম ছেড়ে বেরিয়ে আসা। ২. নিজের পেশার বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সেখানের নানা সঙ্কট, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন। ৩. খানিকটা বৃহত্তর স্তরে গিয়ে গণমাধ্যম এবং শিল্পীর আন্তসম্পর্ককে এই সূত্রে পর্যবেক্ষণ করা। একজন প্রকৃত শিল্পীকে জীবনে এই তিনটি পর্যায় অতিক্রম

করতে হয়। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে 'রুদ্ধসঙ্গীত'-এর দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, প্রমোদ দাশগুপ্তদের মধ্যে উঠে আসে সৃজনশীলতা বনাম সাংগঠনিক অনুশাসনের সংঘাত।

ব্রাত্য বসু বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিষ্ণু বসুর ছেলে। জন্ম সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৬৯। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়ার পর সিটি কলেজে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। গণকৃষ্টি নামে এক থিয়েটার গ্রুপে সাউন্ড অপারেটার রূপে তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়েছিল। এরপর তিনি দলের জন্য নাটক লিখতে ও পরিচালনা করতে শুরু করেন। 'অশালীন' (১৯৯৬) তাঁর প্রথম নাটক। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'অরণ্যদেব', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', 'চ'তুষ্কোণ', ইত্যাদি। 'রুদ্ধসঙ্গীত' নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব থিয়েটার গ্রুপ ব্রাত্যজনের পথ চলা শুরু ২০০৯ সালে। ব্রাত্যজনের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'বোমা', 'সিনেমার মতো', 'আলতাফ গোমস' ইত্যাদি। নাটকের ক্ষেত্রে বর্তমানে 'কোম্পানী থিয়েটার'-এর সম্পর্কে তার ধারণা হল কমার্শিয়াল থিয়েটারের প্রযোজক আর গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালক, এই দুই মেরুকে ধারণা করে তৈরী হয়েছে কোম্পানি থিয়েটার। সেখানে অভিনেতা আর দলবদ্ধ নন। গ্রুপ থিয়েটারে কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে পশ্চিমবঙ্গে এটা 'গ্লাসনস্ত' এসেছে। তাঁর মতে "থিয়েটার কিন্তু স্থানিক। তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে শপিংমল, আইপিএল, মেগা সিরিয়ালের সঙ্গে। স্ট্রাকচারের বদল জরুরি। তাই কোম্পানি থিয়েটারকে আসতেই হতো। পরিচালকই এখন টাকা জোগাড় করেন। কাস্টিং করেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন সংস্করণ, ৪ মে, ২০১৭)।

এবারে আসা যাক 'রুদ্ধসঙ্গীত' নাটক সম্পর্কে আলোচনায়। দেবব্রত বিশ্বাস আড়ালে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গীত রুদ্ধ করার ব্যাপারে অন্তরালে সাড়ে তিনজনের ভূমিকা ছিল। নাম তিনি বলেননি। তবে নাটকে তাঁদের উল্লেখ আছে কখনো চরিত্ররূপে.কখনো শুধু উল্লেখ রূপে। নাটকের প্রথম দৃশ্যের সূচনা ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য গানের মাধ্যমে। গানটা ছিল এইরকম -- "মাউন্টব্যাটন সাহেব ও/ তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও..." এই গানের উল্লেখ আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্যেই সাক্ষাৎ ঘটে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্রর রক্তকরবী প্রযোজনা সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি গণনাট্য সঙ্ঘের কর্মকান্ডের। ঋত্বিক জানায় যে গর্ভমেন্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করেছে। সেই সময়ের দেশভাগ উত্তর দিশাহীন মানুষের কাছে কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল আলোর দিশা। এর পাশাপাশি নাটকে সলিল চৌধুরীর সংলাপে ধরা পড়ে পার্টির ভাঙন দৃশ্য ও ফাঁপা মূল্যবোধের কথা—"দাদাগিরি আর নির্বুদ্ধিতার একটা সীমা তো আছে! আপনারা ভাবুন আমি যখন সুর করলাম 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' আর এইচ.এম.ভি-তে সন্ধ্যা মুখার্জি যখন সেটা গাইলেন পার্টির নেতারা বললেন এটি একটি প্রতিবিপ্লবী গান।....কেননা গানের মাঝখানে আমি বলেছি 'হায়, বিধি বড়োই দারুণ'। অর্থাৎ কমিউনিস্ট হয়েও কেন আমি বিধি বা ভগবানের নাম নিয়েছি?" আরো শোনা গেছে সলিল চৌধুরী ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন করলেও, গণনাট্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এক সময় তাঁকে বলা হয়েছে 'আমি নাকি ইনডিসিপ্লিনড। কার ডিসিপ্লিন? পার্টির? কে পার্টি? ওই কতগুলো মুখ। দ্রুত আমার মোহ চলে যাচ্ছিল। এরই পাশে সত্যিকারের আর্টিস্ট বলতে বুঝিয়েছন দেবব্রত বিশ্বাসকে। ২য় দৃশ্যে দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়ীতে ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধরা পড়ে কমুনিস্ট পার্টির হালহকিকত, বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী গঠনের কথা ইত্যাদি।

যে পার্টি ছিল একসময় অসহায়ের মুখপত্র, তার মধ্যে এল ক্ষমতায়নের লোভ। নাট্যকার সুনিপুণভাবে তা দেখিয়েছেন ৩য় দৃশ্যে। যখন ১৯৫৪ সালে কমরেড জ্যোতি বসুর সামনে ঋত্বিক ঘটকের আচরন তাঁকে

পর্যুদস্ত করতে তাঁর বিরুদ্ধে পার্টির দ্বারা গঠিত কমিশনের নেতা কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ও কমরেড নির্মল ঘোষের কথোপকথন শোনা যায়। এটা নাট্যকারের নিজস্ব সংযোজন।

অরুণ, শীলা, ললিতা (বোন) চরিত্রের দৃষ্টিতে নাট্যকার দেবব্রত বিশ্বাসকে (যাঁকে সবাই জর্জদা বলতেন), তাঁর ভাগ্নে খোকনের প্রতি তাঁর স্নেহ, নিজের জীবন নিয়ে দ্বন্দ্ব, শিল্পীর সঙ্কটকে দেখানো হয়েছে। ৫ম দৃশ্য থেকে শুরু হয়েছে প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা। এই দৃশ্য সূচিত হয়েছে মঞ্চে অন্ধকারে দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া দুটি গান দিয়ে-- 'এসেছিলে তবু আসো নাই' ও 'মেঘ বলেছে যাবো যাবো'। তারপর একটি গলা ভেসে আসে ও বিশ্বভারতীর হিন্দু সন্তান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট লিমিটেডকে দেওয়া তাঁর এই দুটি গান মনোনীত না করার চিঠি পাঠ করা হয়। এরপর পর্দা খোলে। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে নাট্যকার দুটি চরিত্রের নির্মাণ করেছেন --সুচিত্রা মিত্র এবং সন্তোষকুমার ঘোষ। যদিও দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ একটুও ক্ষুন্ন করেননি। অভিমান হয়েছে কিন্তু ভাঙেন নি। নিজের মতে স্থির। এই ভাবেই নাটক এগোয়। নাটকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু নৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকীর উপস্থিতি। আত্মজীবনীতে সেইভাবে কোন উল্লেখ নেই। নাটকে কিন্তু বিশেষভাবে উপস্থিতি। ৪র্থ দৃশ্যের শেষে তিনি জর্জদার সঙ্গে দেখা করতে আসেন জর্জদার বাড়ীতে। সেদিন জর্জদার জন্মদিন। তিনি শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর জন্য জর্জদা দরবেশ আনতে ভিতরে গেলে একা মঞ্জুশ্রী মঞ্চের ফ্রন্ট জোনে এগিয়ে আসেন এবং বলতে থাকেন তাঁর ও জর্জদার সঙ্গে, নৃত্য ও সঙ্গীতের, দুই শিল্পীর মধ্যেকার এক অদ্ভুত আন্তসম্পর্কের কথা, অনুরননের কথা। এরপর জর্জদা জানতে পারেন মঞ্জুশ্রীর বিবাহ স্থির হয়েছে। তিনি তাঁর জন্মদিন ও মঞ্জুশ্রীর বিবাহকে সেলিব্রেট করে গেয়ে ওঠেন-- 'শুধু যাওয়া আসা/ শুধু স্রোতে ভাসা'। দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে আবহ জুড়ে বাজে দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর-- 'হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়/ আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়/ লাজে, ভয়ে ত্রাসে আধো বিশ্বাসে/ শুধু আধখানি ভালোবাসা।' "কোনও সংশয় নেই এই দৃশ্যের অভিঘাত আমাদের স্নায়ু স্পন্দন স্তব্ধ করে দেয় আমরা অনুভব করি নাটকের ভাষার 'লোগস' থেকে 'মেলোস' এ অনুপ্রবেশের এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই আলোচ্য দৃশ্য। ব্রাত্য বসুর নির্দেশনা দেখায়, মানবমনের রক্ত-রহস্য ব্যথা ও আঁধারকে যখন স্পর্শ করতে পারে না প্রচলিত নাট্যভাষা ও 'সংকেতক', চরিত্ররা তখন সহসাই হয়ে উঠতে পারে আশ্চর্য ধাতু ভাস্কর্য বা ফ্রেসকো। আর আবহ ও মঞ্চ কেঁদে উঠতে পারে সংগীতে।"[৪] এমনই মুহূর্ত সৃষ্টি হয় ৮ম দৃশ্যে বা শেষ দৃশ্যে। সাল ১৯৭৯ এপ্রিল। স্থান তাঁর ত্রিকোণ পার্কের বাড়ী। মঞ্জুশ্রী চাকী এসে দেখা করে চলে যাবার পর একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেন। ওপর থেকে একটা আলোকবৃত্ত তাঁকে ধরে। দেবব্রত বসে থাকেন। নেপথ্যে তাঁরই গলায় 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান' গানটি হয়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত থাকেন দেবব্রত বিশ্বাস ও রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সঙ্গীত। পর্দা পড়ে যায়। এইভাবে ব্রাত্য বসুর নির্দেশনা দেখায় কোনো সংলাপ না রেখেও কিভাবে আবহ ও মঞ্চকে সঙ্গীতের প্রয়োগে কাঁদিয়ে ফেলা যায়।

দেবশঙ্কর হালদার ছাড়া এ নাটক হত না। ব্রাত্য বসু নিজেও তাঁর সঙ্গে কথা বলে নাটকটি লিখতে শুরু করেছিলেন। দেবশঙ্করও বলেছেন যে এ চরিত্র করতে গিয়ে অসম্ভব আনন্দ হত। মনে হয়েছে হয়তো তাঁর রঙে নিজেকে রাঙানোটাই ছিল আনন্দ। জয় গোস্বামী এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- "এই নাটকে সেই প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর লড়াই তিনটি স্তরে দেখানো হয়েছে। প্রথম পার্টির সঙ্গে। তাঁরা সবাই নন ক্রিয়েটিভ। এবং সৃষ্টিশীল শিল্পীদের তারা প্রথমে প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিলেন, তাতে জনসংযোগ হবে এবং পার্টিরই সুনাম হবে এই চিন্তায়। পরবর্তী সময়ে, এই পার্টির নেতারা শিল্পীদের সহ্য

করতে পারলেন না।....এই শাসন চালাতে গেলেন নির্মল ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্তরা-- জর্জ বিশ্বাস,ঋত্বিক ঘটকের ওপর। তাঁরা বেরিয়ে এলেন পার্টি থেকে,.....জর্জ বিশ্বাসের দ্বিতীয় সংগ্রাম সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এই প্রতিষ্ঠান হল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড।.....জর্জের বিরুদ্ধে তৃতীয় আক্রমণকারী মিডিয়া বা সংবাদপত্র। জর্জ লড়লেন। হার স্বীকার করলেন না। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেঙে পড়লেন না।"[৫] তিনি যথার্থ শিল্পী। এইভাবে আলোচনা করে দেখা গেল 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' এবং ব্রাত্যজনের 'রুদ্ধসঙ্গীত' কোথাও সৃজনে একাত্ম, আবার সমান্তরাল ভাবেই কোথাও সম্পূর্ণভাবে একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এটাই হল যথার্থ শিল্পকর্ম এবং তা সার্থক।

তথ্যসূত্র:

১. 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত', দেবব্রত বিশ্বাস, পৃ: ৯, করুণা প্রকাশনী, পৌষ ১৪১৭।
২. 'দেবব্রত বিশ্বাসই বাঙালির কর্ণ?', ব্রাত্য বসু, অন্য সময়, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ১৮ আগস্ট ২০১৯।
৩. উপসংহার, ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত, দেবব্রত বিশ্বাস, পৃ: ২০৭, করুণা প্রকাশনী, পৌষ ১৪১৭।
৪. ব্রাত্য বসুর 'রুদ্ধসঙ্গীত' অনেকান্ত অর্থ ও মর্মের সন্ধানী, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৫০, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১০, সম্পাদক ব্রাত্য বসু।
৫. শিল্পীজীবন মৃত্যুহীন, জয় গোস্বামী, পৃ:২২৭, রুদ্ধসংগীত, নগরনট দেবশঙ্কর, প্রতিভাস, সঙ্কলন ও সম্পাদনা শোভন গুন।

সহায়ক গ্রন্থ:

নাটক সমগ্র, ব্রাত্য বসু, ২য় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭